ভজন্ত্যনন্যভাবেন

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধক ও সাধনার দেশ এই ভারতবর্ষ। সেই কোন সুদূর অতীতে—যখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণিরূপে অরণ্যে বিচরণ করছে, তখন এদেশের ঋষিগণ সাধনবলে গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করেছেন; আর অনন্যসুন্দর শব্দবিন্যাসে, সুললিত ছন্দে তা বিধৃত করে রেখে গেছেন উত্তরকালের জন্য। সেই প্রাচীনেরা আঠারো শতকের ইউরোপীয় যুক্তিবাদীদের মতো প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁরা এই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়াও আর একটি বিশাল অতীন্দ্রিয়-জগৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে রাজ্যে বস্তু বা সত্যের প্রমাণ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নয়। বেদান্তের পরিভাষায় তা 'অপরোক্ষ অনুভূতি'। যুগে যুগে ভারতের মাটিতে এমন সব যোগী-তাপস আবির্ভূত হয়েছেন যাঁরা জড় ও চেতনের মিলনসেতু, জগৎকারণ, অদ্বয় ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধিকল্পে দেহসুখ, ভোগৈশ্বর্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে নিরন্তর তপশ্চর্যায় ব্রতী হয়েছেন। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের জড়বাদ এবং ভোগবাদের প্রবল জোয়ারে যখন ভারত তার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য হারাতে বসেছিল, তখন ঋষি উদ্দালকের মতো যিনি সেই জলস্রোত ঠেকিয়ে রেখে দেশকে বাঁচালেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব। নিজের সাধনলব্ধ তেজেই তিনি এই অসাধ্যসাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮৪৭-১৮৫৯—দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী তাঁর সাধনার মূলমন্ত্র ছিল ব্যাকুলতা—ব্যাকুলতার দ্বারা ঈশ্বরলাভের সাধনা। ব্যাকুলতাই তাঁর সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য—তা সে পুরাণমতেই হোক বা গুরুসহায়ে তন্ত্রমতে বা বেদমতেই হোক। এই প্রবন্ধে শুধু তাঁর প্রারম্ভিক সাধনপর্বের কথাই উপস্থাপন করব।

সাধনমার্গে প্রবেশের দুটি দ্বার, একটি শাস্ত্র ও গুরুর নির্দেশনা, অন্যটি সত্যলাভের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধকজীবনে প্রবেশ করেছিলেন শেষোক্ত দ্বারটি দিয়ে। তবে তিনি যে ভেবেচিন্তে ওই পথ বেছে নিয়েছিলেন তা ভাবলে ভুল হবে। অন্তরের ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরদর্শনের আগ্রহাতিশয্যে তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং অনুরাগ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর এক পাশ্চাত্য জীবনীকার রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন—ভগবানের সৌন্দর্যরূপ দেখে আনন্দে বিহ্বল হওয়ার পথটিই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সুপরিচিত। সবকিছুর মধ্যেই তিনি বিধাতার সৌন্দর্যরূপ লক্ষ করতেন। মাত্র ছ-সাত বছর বয়সে, জ্যৈষ্ঠ কী আষাঢ়ের এক সকালে গ্রামের আলপথ দিয়ে যেতে যেতে আকাশজোড়া জলভরা কালোমেঘের কোলে সাদা বকের সারি দেখে তিনি বিহ্বল হলেন : "সে এমন এক বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হুঁশ রইলো না!" বাল্যাবস্থাতেই তাঁর মধ্যে গভীর ধর্মভাবের স্ফুরণ হয়েছিল। বাড়িতে পিতা ও অগ্রজের নৈষ্ঠিক জীবন ও ধার্মিকতা তাঁর চরিত্রের বনিয়াদ তৈরি করে দিয়েছিল। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ তাঁর অতিপ্রিয়

ছিল। পুরী যাতায়াতের পথে কামারপুকুর গ্রামের লাহাবাবুদের ধর্মশালায় যেসব সাধু আশ্রয় নিতেন, বালক গদাধর একাগ্রচিত্তে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ, পূজাপদ্ধতি লক্ষ করতেন, তাঁদের আলোচনা শুনতেন। যে বয়সে বালকেরা গাছে ওঠা, ছোটাছুটি বা ডাণ্ডা-গুলি নিয়ে খেলায় আমোদ পায়, গদাধর সে বয়সে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজা, পুঁথিপাঠ বা সখা-স্যাঙাতদের নিয়ে দেবলীলা অভিনয়ের খেলায় মেতে থাকতেন। তাই বলা যায় যে ধর্মভাব তাঁর সহজাত ছিল। ভাগবতে উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করে শ্রীভগবান বলেছেন (১১।১১।২৩-২৫) : ‘‘শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি আমার চরিতকথা শ্রবণ, আমার লীলাসকল গান ও স্মরণ, আমার জন্মাদি অভিনয় ও আমাতে আশ্রিত হয়ে আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করেন, আমার উপাসক ভক্ত হন এবং সাধুগণ আমার যে পদ দর্শন করেন, তা অনায়াসে লাভ করেন।’’ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই উক্তির যাথার্থ্য দেখা গিয়েছিল। মাত্র দশ-এগারো বছর বয়সে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীকে দর্শন করতে যাবার সময় উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁর অপূর্ব ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়, তখন থেকেই তিনি অনুভব করতে থাকেন যে তাঁর অন্তরে সচ্চিদানন্দময়ী মা সদা বিরাজ করছেন। এই দিব্যদর্শনের দু-তিন বছরের মধ্যে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর অন্তরের ভাব, ইচ্ছা, আশা, উদ্দেশ্য সবই ভিন্নপথে চলছে।

ঈশ্বরলাভের সাধনায় ব্যাকুল ভক্তের লক্ষণগুলি শ্রীমদ্‌ভাগবতে এভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে—‘‘ক্বচিদ্ রুদন্তি অচ্যুতচিন্তয়া, ক্বচিৎ হসন্তি নন্দন্তি বদন্তি অলৌকিকাঃ।/ নৃত্যন্তি গায়ন্তি অনুশীলয়ন্তি অজং, ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥’’ (১১।৩।৩২) ভক্তেরা অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন, কখনও আনন্দিত হন, কখনও অলৌকিক কথা বলেন; কখনও নৃত্যগীত করেন, কখনও তাঁর গুণকীর্তন করতে করতে স্তব্ধ হয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের প্রথম চারবছরে ব্যাকুলতার দ্বারা ঈশ্বরলাভের সাধনায় আমরা এই উক্তির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত সাধনা শুরু হয় যখন তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কালীঘরের পূজারি। তবে আগেই দেখেছি যে সাধনা ছিল তাঁর জীবনধারণের অঙ্গ, ‘সাধনা করব’ মনে করে সাধনায় বসা নয়। মা কালীর পূজা করবার জন্য তিনি কেনারাম ভট্টাচার্য নামে এক প্রবীণ শক্তিসাধকের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। শোনা যায় যে মন্ত্র উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং গুরু তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। সাধকভাবে তিনি প্রথমে জগৎকারণের আরাধনা করেছেন মাতৃভাবে, আনন্দপ্রতিমা দেবীমূর্তির পূজায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন। তিনি ভাবতেন, ‘‘সত্যিই কি ইনি আনন্দঘনমূর্তি জগজ্জননী, অথবা পাষাণপ্রতিমা মাত্র? সত্যিই কি ইনি ভক্তিসমাহৃত পত্রপুষ্পফলমূলাদি গ্রহণ করেন? সত্যিই কি মানুষ তাঁর কৃপায় সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হয়ে দিব্যদর্শন লাভ করে?’’ এই সন্দেহ নিরসনে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই মনোভাবের জন্যই তিনি যখন পূজা করতেন তখন মনে হত যেন খুব নিকট কোনও প্রিয়জনের সেবা করছেন, মনে হত না যে তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মশক্তির আরাধনা করছেন।

অগ্রজ রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি আরও তন্ময় হয়ে গেলেন, পূজার সময় কে এল-গেল তাও যেমন দেখতে পেতেন না তেমনি আশেপাশে যেসব কথাবার্তা হত তাও শুনতে পেতেন না। তাঁর তেজোময় শরীর ও তন্ময় ভাব দেখে অন্য ব্রাহ্মণেরা বলাবলি করতেন—যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব পূজায় বসেছেন। পরে তিনি বলতেন, অঙ্গন্যাস-করন্যাসের সময় মন্ত্রাক্ষরগুলি যেন নিজদেহে সাজানো আছে দেখতেন। দেখতেন যে সর্পাকার কুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথ দিয়ে সহস্রারে উঠে যাচ্ছেন, আবার ‘রং’ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতেন যে সু-উচ্চ অগ্নিশিখা পূজাস্থানকে প্রাচীরের মতো বেষ্টন করে বিঘ্ন থেকে রক্ষা করছে। ফুল তুলে নিজের হাতে মালা গেঁথে মাতৃমূর্তিকে সাজানো এবং প্রাণঢালা গান গেয়ে মায়ের মনোরঞ্জন করা তাঁর পূজার অঙ্গ ছিল। এসময় তিনি লোকসঙ্গ ও অনাবশ্যক কথাবার্তা ত্যাগ করে দিনরাত শুধু মাতৃচিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘‘প্রায় বছরখানেক

শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে একা একা থাকলেন। তাঁর কাজকর্ম, চালচলন অদ্ভুত, যেমন খুশি।... সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন তিনি গভীর প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন।... বিশ্রামের সময় দেবীকে শয়ন দিয়ে মন্দিরের ভিতর দরজা বন্ধ রাখার কথা। সেইসময় গর্ভমন্দিরে নবীন পুরোহিত চেঁচিয়ে কাঁদছেন আর মাকে ডাকছেন : মা আমায় জ্ঞানচৈতন্য দে। তোর স্নেহসুধামাখা মুখখানা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখিসনে, মা। মাগো, আমায় দেখা দে।" লীলাপ্রসঙ্গে দেখি, "ঠাকুরের... সেই অদ্ভুত তন্ময়ভাব, শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া সেই বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধুর্যই অপরকে বুঝানো কঠিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে চার বছরের ছোটো ভাগনে হৃদয়রাম ছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গী। ঠাকুরের ব্যাকুলতার তিনিই ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। হৃদয়ের কাছ থেকে জানা গেছে যে সকলের অগোচরে, রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে তিনি অন্ধকারে জঙ্গলে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। গভীর রাতে তিনি রোজ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যান তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে হৃদয় যখন জানলেন যে তিনি জঙ্গলে ধ্যান করেন, তা থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য ইট-পাটকেল ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে তাঁর ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাতে চাইলেন। কিন্তু ঠাকুরের মন তো তখন ব্রহ্মপদে লীন হয়ে আছে, তাই এসব উৎপাত তাঁর ইন্দ্রিয়গোচর হল না। হৃদয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন—শাস্ত্রে বলে আমলকী গাছের তলায় বসে যে যা কামনা করে ধ্যান করে, তার তা-ই সিদ্ধ হয়। মন্দিরের উত্তরে একটি বটগাছের পাশে তিনি পঞ্চবটী রোপণ ও তুলসীকানন করেছিলেন। পঞ্চবটী-সন্নিহিত জঙ্গলে নিচু জমিতে একটি আমলকী গাছ ছিল, সেখানেই তিনি সাধনার আসন পাতলেন। একরাত্রে সেখানে গিয়ে হৃদয় দেখলেন যে পরনের বসনের সঙ্গে উপবীতটিও ফেলে দিয়ে ঠাকুর ধ্যানমগ্ন। ধ্যানভঙ্গের পর নিঃসংকোচে মামা জানালেন যে জন্মাবধি মানুষ লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কুল, শীল, মান, জাতি, অভিমান—এই অষ্টপাশে আবদ্ধ থাকে। সব পাশ ফেলে দিয়ে তবে মাকে ডাকতে হয়। 'মা'কে পাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সবই তুচ্ছ। তাই বসন ফেলে দিয়ে তিনি যেমন লজ্জার পাশ কাটিয়েছেন, নিশীথে একা জঙ্গলে বসে তেমন নির্ভয় হয়েছেন, আবার উপবীত ফেলে জাতির অভিমান থেকে মুক্ত হয়েছেন। যেসব জিনিসের নামেই মানুষ ঘৃণা বোধ করে তা তিনি অবলীলায় মাথায় তুলে, জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করে ঘৃণা জয় করেছেন। পাশমুক্তি শুধু কথার কথা নয়, তিনি তার পরিপূর্ণতা দেখিয়েছেন। পরবর্তী কালে তিনি ভক্তদের বলতেন : চিত্ত শুদ্ধ না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বকে টানে না। মাটি-কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়, তখন ঈশ্বরদর্শন হয়।

শাস্ত্র বলেছেন, যা ত্যাগ করবার তা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করতে হয়। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগের স্বরূপ দেখলাম। 'মা'কে প্রত্যক্ষ করবার জন্য কী দুঃসহ আকুলতা তাঁর মনকে আলোড়িত করেছিল তা তাঁর নিজের কথাতেই শুনি : "আমায় বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম, কোথা দিয়ে দিন চলে যেত, 'মা মা' বলে এমন কাঁদতাম যে লোক দাঁড়িয়ে যেত।" গঙ্গাতীরে মাটিতে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলতেন, "মা, আর একটা দিন চলে গেল, এখনো দেখা দিলি না!" কখনও মন্দিরে মায়ের মূর্তির সামনে করজোড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, "রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?" এপ্রসঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরের পুরোহিত রাম চাটুজ্যে বলেছিলেন, "এখন ভক্তেরা বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার—তিনি সর্বধর্মের সাধনা করেছিলেন, তা বাপু তোমরা তো দেখনি কী কঠোর সাধনা করেছিলেন পরমহংসদেব! সাধারণ মানুষ অমন সাধনা করলে কোনকালে মারা যেত।" একদিন তিনি শুনতে পেলেন গঙ্গার ধারে বহু লোক বলাবলি করছে যে ছোটো ভট্টাচার্যের পাগলামি আবার বেড়েছে। কাদায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন, মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। শুনে উদ্‌বিগ্ন রামচন্দ্র দ্রুত ঘাটে গেলেন। তাঁকে কোনওরকমে সুস্থ করে মন্দিরে নিয়ে এলেন। তাঁর ব্যাকুলতা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে একদিন তিনি স্বহস্তে জীবনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। মা

কালীর হাতের খাঁড়া নিয়ে নিজের জীবন শেষ করতে যাবার উদ্যোগ করতেই মায়ের অদ্ভুত দর্শন পেলেন। এই দর্শন সম্বন্ধে লীলাপ্রসঙ্গে রয়েছে—''ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!... এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!'' তিনি মায়ের বরাভয়দায়িনী শান্ত মূর্তি দেখতে পেলেন।

''ব্যাকুলতা না হলে হবে না'', তিনি বলতেন, ''আমি মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতুম, মা বলতে বলতে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম! যেমন জেলেরা জাল ফেলে, তারপর অনেকক্ষণ ধরে জাল গুটোতে থাকে।'' ''কি অবস্থাই গেছে! মুখ করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর মা বলতুম। যেন মাকে পাকড়ে আনছি। উন্মাদের মতো অবস্থা হয়েছিল।'' ''মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; জলশূন্য করিবার জন্য লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে... অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম, মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি!—দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!''

ধ্যান করতে বসে তিনি দেখতেন রাশীকৃত জোনাকির মতো বিন্দু বিন্দু জ্যোতির রাশি, কখনও বা কুয়াশার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চারিদিক আচ্ছন্ন, আবার কখনও তরল রুপোর মতো উজ্জ্বল জ্যোতি সবকিছু ছেয়ে আছে। মার কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানাতেন—যা করলে তোকে পাওয়া যায় তুইই আমাকে তা শিখিয়ে দে। ধ্যান করতে করতে তাঁর নানা দর্শন হত। প্রত্যক্ষ করেছিলেন সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথাল সন্দেশ, দুটি মেয়ে। মনকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কী চায়। মন বললে—ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না। এইরকম ব্যাকুলতায় মা কি সাড়া না দিয়ে পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান! এখন থেকে পূজা বা ধ্যানের সময় তো কথাই নেই, অন্যসময়ও তিনি দেখতেন জ্যোতির্ময়ী মা হাসছেন, কথা কইছেন, 'এটা কর, ওটা করিস না' বলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন।

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, ''ঠাকুর বলিতেন ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতর্কিতভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চাপিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও সফল হওয়া যায় না।'' শ্রীরামকৃষ্ণ সগৌরবে 'ঝঞ্ঝার অন্তরীপ' প্রদক্ষিণ করে ফিরলেন। এই ঘটনা আমাদের কাছে যেমন অসামান্য, তেমনই মূল্যবান। দ্বাপরে ভক্তপ্রবর অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে বেদপাঠ, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, চান্দ্রায়ণাদি কঠোর ব্রতসাধন, দান প্রভৃতির দ্বারা নয়, ভক্তের আকুলতাই তাকে ঈশ্বর-সন্নিধানে নিয়ে যেতে পারে। অর্জুনের অহেতুকী ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণের কাছে মনপ্রাণসমর্পণ—এসব কারণেই দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে শ্রীভগবান তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কলির ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সংশয়ক্লিষ্ট, বিমর্ষ ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর জন্য অমৃতমন্ত্র রেখে গেলেন—আচার বা নিয়ম নয়, উপচার-উপকরণ নয়, হৃদয়ের ব্যাকুলতাই শুধু পারে ভক্তকে আনন্দময় ব্রহ্মশক্তির কাছে নিয়ে যেতে, যেখানে দুঃখের তমিস্রা নেই, ব্যর্থতা বা অপ্রাপ্তির হা-হুতাশ নেই—শুধুই আনন্দের জ্যোতিঃসমুদ্র।✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৯), খণ্ড ১

২। রোমাঁ রোলাঁ, *রামকৃষ্ণের জীবন* (অনুবাদ ঋষি দাস, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি : কলকাতা, ১৯৬৮)

৩। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ : নৈঃশব্দ্যের মুখ* (সুবর্ণরেখা : কলকাতা, ১৯৮৩)

৪। তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ ও দক্ষিণেশ্বরের মানুষ* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ২০০৯)